Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 91-102
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.052

২০২৪ সালে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান এবং ভারত–বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর এর প্রভাব: একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

সৌমেন মণ্ডল, *রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শিশুরাম দাস কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

India and Bangladesh share deep-rooted bonds of history, language, culture, and numerous other commonalities. The outstanding nature of bilateral ties is reflected in an all-encompassing partnership based on sovereignty, equality, trust, and understanding. This partnership has evolved as a model for bilateral relations for the entire region and beyond. However, the internal political situation in Bangladesh has been complicated at different times. At times, military coups and interim governments have governed Bangladesh. Finally, in 2009, a stable government was formed under the leadership of the Awami League, which remained in power for 15 years. From 2009 to 2024, the opposition made serious allegations against the ruling Awami League government, including widespread corruption, human rights violations, the loss of freedom of speech, and vote rigging. The ongoing movement demanding student rights and quota reform intensified in 2024, taking the form of a mass movement. This movement led to a mass uprising in Bangladesh, and the Prime Minister was forced to resign, which ultimately led to the fall of the government. In this political context, the bilateral relations between Bangladesh and India have deteriorated. This article examines the changing nature of India-Bangladesh trade relations in the post-Sheikh Hasina period, under the interim government, focusing on areas of collaboration as well as emerging challenges. Through an analysis of the historical context, current diplomatic landscape, and prospects, this paper aims to provide insights into the complexities of bilateral trade relations between the two nations.

Keywords: Bilateral, BIMSTEC, Doctrine of Necessity, Inland, Interim government, Protocol, sovereignty

দক্ষিণ এশিয়ার দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা অপরিসীম। ভারত ও বাংলাদেশ এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; দুই দেশই তাদের জাতীয় স্বার্থকে মাথায় রেখে বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। সীমান্ত সুরক্ষা, পরিবহণ, চিকিৎসা পরিষেবা, মানবিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, সন্ত্রাস দমন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। ২০২২ সালে ভারত ও বাংলাদেশ নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে মজবুত করতে 'The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)'

স্বাক্ষর করেছে (Ministry of External Affairs, Government of India, ২০২২)। তবে দুই দেশের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সমস্যাও রয়েছে, যেমন- অবৈধ অনুপ্রবেশ, তিস্তা জল বণ্টন, সীমান্ত হত্যা, চোরাচালান প্রভৃতি। সাম্প্রতিক আগস্ট, ২০২৪ সালে ছাত্র ও সাধারণ জনগণের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান ঘটে এবং শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। এরকম একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় বাংলাদেশে। এই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। মূলত এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থান এবং এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'বাংলাদেশ' স্বাধীনতার ইতিহাস:

১৯৪৭ সালে ভারত থেকে বিভক্তির পর বর্তমান বাংলাদেশ তৎকালীন (পূর্ব পাকিস্তান) বৃহত্তর পাকিস্তানের অংশ ছিল। দীর্ঘ আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত একই রাষ্ট্র হওয়ার সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ছিল প্রায় ২০০০ কিলোমিটারের ভৌগোলিক দূরত্ব। আর এই দূরত্বের কারণে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান দুই অঞ্চলের মধ্যে ধর্মীয় সাদৃশ্য থাকলেও ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টিগত প্রভেদ ছিল বিস্তর। বিপুল জনসংখ্যা ও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বিস্তর এই ভূখণ্ড রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করত পশ্চিম পাকিস্তান সরকার। ইসলামাবাদের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিকীকরণ ও অবহেলিত হওয়ার কারণে তারা নিজেদেরকে তাদের মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করত। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে নবগঠিত ডোমিনিয়নের মধ্যে পূর্ব বাংলায় বাংলাভাষী মানুষ ছিল প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ। কিন্তু বাংলা ভাষার পরিবর্তে সরকারি অফিস, আদালত, মুদ্রা, নোট, পোস্টকার্ড, ডাকটিকিট, রেলটিকিট, মানিঅর্ডার খাম, স্ট্যাম্প প্রভৃতিতে উর্দু ও ইংরাজি ভাষাকে ব্যবহার করা হত, যার ফলে বাঙালিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে। উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার দাবিতে তমুদ্দিন মজলিসের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে প্রথম রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রথম পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যেখানে তিনি উর্দু ও ইংরাজির পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা প্রদানের কথা বলেন এবং পরিষদের বাঙালি সদস্য প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। তবে অধিবেশনে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সদম্ভে ঘোষণা করেন যে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে 'একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্র ভাষা রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে'("The Liberation War of Bangladesh", by Mohammad Anisuzzaman, 2022, pp. 891)। এছাড়া বাঙালি সদস্য তমিজউদ্দিন খাঁ -এর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে ও সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে প্রস্তাবটিকে বাতিল করে দেয়। ১৯৪৮ সালে ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢাকায় আসেন এবং ২১শে মার্চ এক জনসম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন এবং বলেন 'পাকিস্তানি মুসলিমদের বিভক্ত করার জন্য ভাষা ইস্যুটি তৈরি করা হচ্ছে, উর্দু ভাষাই হল মুসলিম জাতির চেতনার মূর্ত প্রতীক। উর্দু ভাষাই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং এর বিরোধিতা যারা করে তারা হল পাকিস্তানের শত্রু' ("The Bangladesh Liberation War, the Sheikh Mujib Regime" by Caf

Dowlah, 2016, pp. 75)। ঐ বছর নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রসমাবেশে বক্তৃতা রাখেন। জাতীয় ভাষা কমিটির ছয় সদস্যের দল, যার মধ্যে- আজিজ আহমেদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল কাশেম, কামরুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল মান্নান এবং তাজউদ্দিন আহমেদ, উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা প্রদানের জন্য লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন, কিন্তু তা খারিজ করে দেওয়া হয়। আর এখান থেকেই ছাত্র ও গণ আন্দোলন ধীরে ধীরে তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ঢাকায় এক মাসের জন্য সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয় এবং আইন অমান্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। ছাত্ররা আইনসভা ভবন ঘেরাও করতে যাওয়ার আগে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলি চালায়, যার ফলে রফিকউদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার, আবুল বরকত এবং শফিউর রহমান নিহত হন। ১৯৫২ সালের সরকারের এই বর্বরোচিত ঘটনার ফলে মুসলিম লীগ বাঙালি জনগণের সমর্থন হারায় এবং ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। আর এই পরাজয়ের পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব পোষণ করে। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সংবিধানের ২১৪(১) অনুচ্ছেদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এর পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্বল নেতৃত্ব, প্রধানমন্ত্রী পদে ঘন ঘন পরিবর্তন, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সংকট, পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের চাপ প্রভৃতি ঘটনার ফলে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ই অক্টোবর ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের সামরিক সরকারের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি তার শাসনামলে (১৯৫৮-১৯৬৯) পাকিস্তানের সংবিধান বিলোপ করেন ও প্রধানমন্ত্রী পদের অবসান ঘটান।

বস্তুত, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অর্জিত পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজ রোপিত হয়। ১৯৬২ সালের প্রকাশ্য সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে মুজিবুর রহমানের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের ফলে জেনারেল আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হয় জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে। তিনি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে শীঘ্রই পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করা হবে, যেখানে সাধারণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতার ভার অর্পণ করা হবে। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট পায় এবং সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয় লাভ ("The Liberation War of Bangladesh," by Mohammad Anisuzzaman, 2022, pp. 899)। অপরদিকে, নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পরাজিত হয়। নির্বাচনে জয় লাভ করার পর আওয়ামী লীগ পাকিস্তানে সরকার গঠন করতে চাইলে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ববর্গ পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে অস্বীকার করে। যার ফলে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ ও প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়, যা ধীরে ধীরে তীব্র আকার ধারণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের স্বাধিকারের দাবিকে চিরতরে নির্মূল করতে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সরকার

সেনাবাহিনী কর্তৃক 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালিত করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দল ও আধাসামরিক বাহিনী যেমন- রাজাকার, আল বদর, আল শামস এগিয়া আসে। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে সামরিক বাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে এবং আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। গ্রেপ্তারের পর মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ 'স্বাধীন বাংলাদেশ' ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সমাজের সকল স্তরের বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান জানান। ২৭শে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে আন্তর্জাতিক স্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার বার্তা ছড়িয়ে দেন। একদিকে পাকিস্তানি সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সাধারণ জনগণকে নিয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনীর মধ্যে শুরু হয় এক অসম সশস্ত্র যুদ্ধ। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের সহায়তাকারী আধাসামরিক বাহিনীর দ্বারা গণহত্যা, উচ্ছেদ ও ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যায় প্রচুর সাধারণ মানুষ নিহত হয়। বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে সারা দেশব্যাপী নিহতের সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ লাখের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া প্রায় তিন কোটি মানুষ দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু হয় এবং প্রায় এক কোটি বাঙালি শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয় ("India-Bangladesh relations: Strategic partnerships and challenges." P. Chaudhuri, 2021, pp. 56) । বাংলাদেশ যুদ্ধে বাঙালি উদ্বাস্তুদের দুর্দশা ভারতবাসীকে চিন্তিত করে তোলে। ক্রমবর্ধমান মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীকে সমর্থন করে জাতিগতভাবে বাঙালিদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনে সমর্থন প্রদান করে। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের ওপর আক্রমণ করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মেজর জেনারেল শ্যাম মানেকশ'র নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা বাংলাদেশী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে তোলে মিত্রবাহিনী। ভারতীয় স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ চালিয়ে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের সমস্ত সেনা ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করায় দীর্ঘ ৯ মাস যাবত চলতে থাকা এই সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর লেফট্যানেন্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী তার প্রায় ৯০,০০০ সেনাসহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ কমান্ডের প্রধান মেজর জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি ঘোষণার সাথে সাথে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন, 'Dhaka is now free capital of a free country. All nations who value human spirit will recognize it as a significant milestone in man's quest for liberty' ("ভারতের বিদেশনীতি ও সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি", বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, দেবাশিস নন্দী, 2012, pp. 108) । আর এরই সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কখনো জটিল হয়েছে, আবার কখনো হয়ে উঠেছে সৌহার্দ্যপূর্ণ। অর্থাৎ যে আন্দোলন ভাষার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল, সে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মের মধ্য দিয়ে যার অংশীদার ছিল ভারত।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি:

সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান থেকে সার্বভৌমত্ব অর্জন করে, যার ফলে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের' জন্ম হয় এবং ১৬ই ডিসেম্বর এই দিনটিকে বাঙালিরা বিজয় দিবস হিসাবে পালন করে। তবে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত এই স্বাধীনতা জনগণের কাছে খুব সুখকর অভিজ্ঞতা বহন করে আনেনি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ হয়েছে এবং কোনো রাজনৈতিক দলই দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে পারেনি। ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ নতুন সংবিধান অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার গঠন করে, কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানপন্থী মৌলবাদী গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ১৯৭৫ সালে সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে, যার ফলে দেশে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে থাকে যেমন- ১৯৭৭ সালে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন, ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত জেনারেল এইচ এম এরশাদের সামরিক শাসন, ১৯৯০ সালে ছাত্র সমাজ কর্তৃক গণঅভ্যুত্থান, বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP) সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সরকার গঠন করেন। ১৯৯৬ সালে জুন মাসে সপ্তম সাধারণ নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে পরাজিত করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখল করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ২০০১ সালে অষ্টম সাধারণ নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার গঠিত হয়, যার প্রধানমন্ত্রী হন খালেদা জিয়া। ২০০৬ সাল থেকে ২০০৮ সালে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং এই পর্বে রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা জারি হয় এবং ফখরুদ্দিন আহমেদের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার শাসন পরিচালনা করে। এই সময় রাজনৈতিক দলের নেতাদের গ্রেপ্তার, বাক স্বাধীনতা লঙ্ঘন, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রভৃতি ঘটনা ঘটতে থাকে। ২০০৮ সালে ২৯শে ডিসেম্বর নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মহাজোট সরকার গঠিত হয়। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

শেখ হাসিনার শাসনকাল:

২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংসদের ২৬০টি আসনের মধ্যে ২৩০টি আসনে জয়লাভ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ। ক্ষমতায় আসার পর সংবিধান সংশোধন করে ২০১১ সালে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয়। ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে আবারও ২৩৪ টি আসন নিয়ে শেখ হাসিনা সরকার গঠন করে। দুর্নীতি ও ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান খালেদা জিয়া ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন বয়কটের ডাক দেয়। ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৫৭ টি আসন পায় এবং BNP ও অনান্য সমস্ত বিরোধী দল মিলে মোট ৮ টি আসন পায়। বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচনকে প্রহসনমূলক নির্বাচন বলে আখ্যা দেয় এবং নির্বাচনে ব্যালট চুরি, ছাপ্পা ভোট, ভোট লুঠ, প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ আনে। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২৫ টি আসন পায়, তবে এই নির্বাচনের আগে অধিকাংশ BNP-র প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ব্যাপক দুর্নীতি, বিরোধী দলের কণ্ঠ রোধ, ভোট কারচুপি,

মানবাধিকার লঙ্ঘন, বাক স্বাধীনতা লঙ্ঘন, গণমাধ্যম গুলিকে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ ওঠে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থান:

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে বাংলাদেশ সরকার। সে সময় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মেধাতালিকায় ২০ শতাংশ বরাদ্দ রেখে, ৪০ শতাংশ জেলা ভিত্তিক, ৩০ শতাংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য এবং ১০ শতাংশ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। তবে পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার এই কোটা ব্যবস্থাটি পরিবর্তন করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৫৬ শতাংশের বেশি আসন কোটা হিসাবে সংরক্ষিত রাখা হয়, যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০ শতাংশ, জেলাভিত্তিক কোটা ১০ শতাংশ, নারীদের জন্য ১০ শতাংশ, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য ৫ শতাংশ এবং ১ শতাংশ প্রতিবন্ধীদের জন্য। যার ফলে মাত্র ৪৪ শতাংশ প্রার্থী মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীদের একটি বড় অংশের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, কারন তারা মাত্র ৪৪ শতাংশ আসনে প্রতিযোগিতার সুযোগ পাচ্ছিল এবং কোটার অধীনে থাকা প্রার্থীদের থেকে বেশি নম্বর পেয়েও বঞ্চিত হচ্ছিল। দীর্ঘদিনের এই বঞ্চনার ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও চাকরি প্রত্যাশীরা ২০১৮ সালে জানুয়ারি মাস থেকে 'সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের' নেতৃত্বে বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে পাঁচ দফা দাবি পেশ করে এবং ধারাবাহিক আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী গ্রহণ করতে শুরু করে। এই আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোটা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করলে সরকার ২০১৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে নোটিফিকেশন প্রকাশ করে। ২০২১ সালে উক্ত পরিপত্রের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে আহিদুল ইসলামসহ সাতজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হাইকোর্টে আপিল করেন। ২০২৪ সালের ৫ই জুন বিচারপতি কে এম কামরুল ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চ এই পরিপত্রকে বাতিল করে রায় দেন এবং কোটা পুনরায় বহাল করার নির্দেশ প্রদান করেন। রায় প্রকাশের পরপরই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুনরায় আন্দোলন শুরু করে এবং কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আন্দোলন দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। জনগণের মধ্যে সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতির অভিযোগ, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা পরিবর্তনের পথের অভাব নিয়ে যে উদ্বেগ ছিল, তা এই আন্দোলনে আরও চরম মাত্রা নেয়। ১৬ই জুলাই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে, আন্দোলন দমাতে পুলিশের অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের ফলে সংঘর্ষ ঘটে এবং পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদসহ পাঁচজন শিক্ষার্থী নিহত হন। ঢাকাসহ সারা দেশজুড়ে আন্দোলন জোরালো হয় এবং সহিংস আকার ধারণ করে। ২১শে জুলাই উচ্চ আদালত পূর্বের কোটা বহালের রায় বাতিল করে সরকারি চাকরিতে ৯৩ শতাংশ মেধাভিত্তিক নিয়োগের নির্দেশ দেয়। আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ সরকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়, ইন্টারনেট ও মোবাইল পরিষেবা বন্ধ করে দেয় ও সারা দেশে প্রতিরক্ষা বাহিনী যেমন পুলিশ, র‍্যাব, ও বিজিবি মতায়েন করে। সরকার আন্দোলন দমন করতে পুলিশের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেয় ও সারা দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী 'বাংলাদেশে গণহত্যায় ২০২৪ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৫ই আগস্টের মধ্যে প্রায় ১৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হন' ("Recent Developments in India Bangladesh relations." by Harsimran Kaur, pp. 24)। তবে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২৫ সালের ৩০শে জুন নিহতদের একটি তালিকা প্রকাশ করে যেখানে ৮৪৪

জনকে শহীদ হিসেবে উল্লেখ করে তাদের নাম পরিচয় তুলে ধরে। ৩রা আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সকল দাবি একত্রিত করে একটি চূড়ান্ত দাবি উত্থাপন করেন যার নাম দেয় 'এক দফা দাবি'। এই দাবির মূল লক্ষ্য ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রীসভার নিঃশর্ত পদত্যাগ। ৫ই ফেব্রুয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা আসিফ মাহমুদের ডাকে একদফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচীর ডাক দেন। ঐ দিন সারা দেশ থেকে আন্দোলনকারীরা এবং লাখো লাখো সাধারণ জনতা রাজধানী ঢাকায় উপস্থিত হয় ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন 'গণভবনে' প্রবেশ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা অবাধে গণভবন ও সংসদ ভবনে চড়াও হয় এবং সরকারি সম্পদ ধ্বংস করে। এরকম এক বিশৃঙ্খল ও উত্তাল পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামরিক উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে গোপনে দেশত্যাগ করেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটির বিলোপ করেছিলেন, আর তাই নতুন সংশোধিত বাংলাদেশ সংবিধানের কোথাও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করলে কিংবা দেশত্যাগ করলে শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব কে পালন করবে বা নতুন সরকার গঠন নিয়ে বিদ্যমান সংবিধানে কোনো বিধান উল্লেখ ছিলোনা। তাই ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা দেশত্যাগ করলে বাংলাদেশ এক সাংবিধানিক সংকটের সম্মুখীন হয়। ৫ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর দেশত্যাগের পর ৬ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ও সামরিক বাহিনীর প্রধান ওয়াকার উজ জামান দেশের বৈষম্যবিরধী ছাত্র আন্দোলনকারী নেতৃবর্গ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং বিদ্যমান সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৮ই আগস্ট ২০২৪ রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে ১৬ জন সদস্যের হাতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্ষমতা অর্পণ করেন। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ 'The Doctrine of Necessity' বা প্রয়োজনের তত্ত্বের ভিত্তিতে ইউনূস সরকারের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছে। আদালতের যুক্তি হল প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে যার জন্য সংবিধানে কোনো সমাধান নেই। প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এর বক্তব্য অনুযায়ী 'আপিল বিভাগের মত হলো সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে, সংসদ না থাকলে একজন উপদেষ্টা ও কয়েকজন অন্যান্য উপদেষ্টাকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা যেতে পারে। সুতরাং, অন্তর্বর্তী সরকারের সাংবিধানিক বৈধতার অভাব সত্ত্বেও ব্যাপক জনসমর্থন ও প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদ ইউনূস সরকার বর্তমান বাংলাদেশ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। ভারত, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন জানায়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রাণালয় ১৬ই আগস্ট ২০২৪ একটি রিপোর্টে উল্লেখ করে, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে বাংলাদেশ প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসের দূরভাষে আলাপ হয়, যেখানে তিনি ইউনূসকে অভিনন্দন জানান এবং একটি গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ এবং প্রগতিশীল বাংলাদেশের জন্য ভারতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশে হিন্দু ও সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার গুরুত্ব উল্লেখ করেন। প্রতিক্রিয়ায় প্রোফেসর ইউনূস নিশ্চিত করেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশে হিন্দু ও সকল সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবে। দুই নেতাই নিজ নিজ জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন' (Ministry of External Affairs, Government of India, 2024)। ইউনূস সরকার ২০২৫ সালের জুলাই মাসে একটি সনদ প্রকাশ করেন যেখানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বৈধতা প্রদানের জন্য ও সংবিধান

সংশোধনের জন্য ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'Referendum বা গণভোটের' আয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক:

দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের সাথে তার প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কখনো সৌহার্দ্যপূর্ণ আবার কখনো জটিল হয়েছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও গণঅভ্যুত্থানের কারণে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পারদ কিছুটা নিম্নগামী হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সবথেকে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার হল বাংলাদেশ এবং বিশ্বে ভারতের প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অষ্টম স্থানে রয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশের দিক থেকে চিনের পর ভারত হল বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। ভারত ও বাংলাদেশের বিগত ৫ বছরের বাণিজ্য তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ৫ বছরে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ভারত থেকে বাংলাদেশের আমদানি মূল্য ছিল ৮২০০.৭৫ মার্কিন ডলার এবং ভারতে রপ্তানি মূল্য ছিল ১২৬৪.৭৪ মার্কিন ডলার। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত–বাংলাদেশের বাণিজ্য আমদানি মূল্য হয় ১১০৬৫.৮৭ মার্কিন ডলার এবং ভারতে রপ্তানি মূল্য হয় ১৮৪৪.৭৬ মার্কিন ডলার (Ministry of External Affairs, Government of India, 2024)। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলে সেগুলি হল–

বস্ত্রবয়ন শিল্প (Textile Industry):

ভারতীয় তুলা ও সুতোর একটি প্রধান বাজার হল বাংলাদেশ। ২০২৩–২৪ অর্থবর্ষে ভারত বাংলাদেশকে তুলা ও সুতো রপ্তানি করেছে প্রায় ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৫ সালে ভারত ৩.৫৭ বিলিয়ন ডলারের সুতো রপ্তানি করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ ক্রয় করেছে মোট রপ্তানির ৪৫.৯ শতাংশ। ভারতীয় রপ্তানিকৃত তুলা ও সুতোর ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ ভারত বাংলাদেশে পাঠায়। দুই দেশের যৌথ সমন্বয়ের ভিত্তিতে বস্ত্রবয়ন শিল্প বিস্তার লাভ করেছে। ভারত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন- তুলা, সুতো, কাপড়, মেশিন যন্ত্রাংশ প্রভৃতি বাংলাদেশে পাঠায় এবং বাংলাদেশ দক্ষ কারিগর ও স্বল্প ব্যয়কৃত শ্রমিক এবং অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে উচ্চমানের পোশাক উৎপাদন করে। বাংলাদেশ ভারতসহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ গুলিতে রেডিমেড পোশাকের চাহিদার যোগান দিয়ে থাকে। ভারত তুলনামূলক স্বল্প দামে বাংলাদেশ থেকে উচ্চমানের রেডিমেড বা তৈরিকৃত পোশাক ক্রয় করে। ২০২৫ সালের মে মাসে রাজনৈতিক কারণে দুই দেশ তাদের স্থলপথে পরিবহণে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে, যার ফলে জলপথে পরিবহণ চালু হয় আর এই জলপথে পরিবহণ অধিক ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। বর্তমান দুই দেশের বস্ত্রশিল্পে আদান-প্রদান ৩০ শতাংশেরও অধিক কমে গেছে, যার ফলে দুই দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

বিদ্যুৎ (Power):

ভারত বাংলাদেশের প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহকারী দেশ, ভারত ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ রপ্তানি করেছে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট রপ্তানির ১০ শতাংশ। বাংলাদেশে জ্বালানি ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ ভারত থেকে দৈনিক ২.৫ জিগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করে। মূলত Adani Power, NTPC, PTC India প্রভৃতি ভারতীয় কোম্পানি বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দুই

দেশের বিদ্যুৎ বিষয়ক যৌথ কর্মগোষ্ঠী (JWG) ও জয়েন্ট স্টিয়ারিং কমিটি (JSC) বিদ্যুতের আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারন করে। বিদ্যুৎ প্রবাহকে আরও সহজ করতে সাম্প্রতিক ত্রিপাক্ষীয় চুক্তি হয়েছে যেখানে নেপাল-ভারতীয় ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ২০২৪ সালের শেষের দিকে প্রায় বিদ্যুৎ খাতে ৯০০ মিলিয়ন ডলার বিদ্যুৎ খাতে বকেয়া পড়ে গিয়েছিল, যার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল। তবে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ৪৫০ মিলিন ডলার অর্থ পরিশোধ করায় বিদ্যুৎ পরিবহণ আবার স্বাভাবিক হয়।এছাড়াও ভারতের সহায়তায় নির্মিত হচ্ছে 'মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট' -এর মতো প্রকল্প। বাংলাদেশ পশুর নদী তীরে নির্মিত ১৩২০ মেগাওয়াটের এই 'মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট' যা ভারতের Bharat Heavy Electricals Limited এবং Bangladesh Power development Board যৌথভাবে নির্মাণ করছে।

মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প (Automobile Industry):

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে মোটরগাড়ি বাণিজ্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে স্বল্প মূল্যের দুই চাকা ও চার চাকার গাড়ির ব্যপক চাহিদা রয়েছে, যা ভারতীয় কোম্পানিগুলোর কাছে এক বিশাল বাজার তৈরি করে। ভারত বাংলাদেশে দুই চাকার যানবাহন যেমন- বাজাজ, হিরো মোটোকর্পস, টিভিএস মোটর প্রভৃতি এবং হেভি ভিইকেলস যেমন টাটা, আশোক লেইল্যান্ড, এইচার প্রভৃতি কোম্পানির গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ রপ্তানি করে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি ও উচ্চ আমদানি শুল্কের (প্রায় ৪৫%) কারণে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য ব্যহত হয়েছে।

কৃষিজ পণ্য (Agriculture):

প্রতিবেশী রাষ্ট্র হওয়ায় ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশই কম সময় ও স্বল্প ব্যয়ে কৃষিজ পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করে। ভারত তুলা, চাল, গম, ভুট্টা, চিনি, পেঁয়াজ, মশলা, তেল এছাড়াও প্রয়োজনীয় কৃষিজ রাসায়নিক সার বাংলাদেশে রপ্তানি করে এবং বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট, সুপারি, মশলা, তামাক, প্রস্তুতজাত খাবার, সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ি, চামড়া ও জুতা প্রভৃতি বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে। স্থলপথে পেট্রাপোল-বেনাপোল, গেদে-দর্শনা চেকপয়েন্ট বন্ধ থাকায় দুই দেশের আমদানি ও রপ্তানিতে ভাটা পড়েছে, যার ফলে দুই দেশেরই উৎপাদিত পণ্য ও কৃষির ক্ষতি হচ্ছে।

ঔষধ ও রাসায়নিক (Pharma and Chemicals):

ওষুধ ও রাসায়নিক শিল্পে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য লক্ষ্য করা যায়। ভারত থেকে ৩০ শতাংশ ওষুধ প্রস্তুতের উপাদান ও কাঁচামাল সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ভারত থেকে স্বল্প দামে সর্বাধিক পরিমাণে প্রস্তুতকৃত ওষুধ এবং ওষুধের উপাদান (Active Pharmaceutical Ingredients), চিকিৎসা সরঞ্জাম ও সার্জারি যন্ত্রাংশ আমদানি করে। এছাড়াও ভারত বাংলাদেশে জৈব রাসায়নিক, লবণ ও সালফার সরবরাহ করে।

পর্যটন শিল্প (Tourism Industry):

বাংলাদেশী পর্যটকদের কাছে ভারত হল একটি বিশেষ গন্তব্যস্থল। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বাংলাদেশ থেকে ২০ লক্ষেরও বেশি পর্যটক ভারতে ভ্রমণ, স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা, কেনাকাটা ও সাংস্কৃতিক উৎসবে যোগ দিতে এসেছে। ভারতে পর্যটন শিল্পের মধ্য দিয়ে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পরিবহণ, ছোট ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ভিসায় প্রতিবন্ধকতা আনার ফলে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে ২০ শতাংশ বাংলাদেশী

পর্যটকের আগমন কমেছে, যার ফলে ভারতের পর্যটন শিল্প ও ব্যবসায়িক মহল কিছু অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতে প্রতি বছর ভ্রমণকৃত পর্যটকদের মধ্যে সর্বাধিক পর্যটক ভ্রমণকরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৮.১৪ শতাংশ, বাংলাদেশ থেকে ১৭.৭৫ শতাংশ, ব্রিটেন থেকে ১০.২৮ শতাংশ ও অস্টেলিয়া এবং কানাডা থেকে যথাক্রমে ৫.২০ ও ৪.৮৭ শতাংশ। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পেতে ভারতে আসে, যার ফলে ভারতে বেসরকারি হাসপাতালগুলো লাভবান হয়, কিন্তু ভিসা বন্ধের কারণে চিকিৎসা পরিষেবা খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

তেল ও গ্যাস (Oil and Gas):

ভারত বাংলাদেশকে জ্বালানি তেল ও গ্যাস সরবরাহ করে, ২০২৩ সালে ভারত বাংলাদেশ 'মৈত্রী পাইপ লাইন' স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে এই সরবরাহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে সাশ্রয়ী মূল্যে ডিজেল রপ্তানি করে, যা বাংলাদেশের জ্বালানির খরচ অনেক কমায়। বাংলাদেশ ১৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ 'মৈত্রী পাইপ লাইনের' মাধ্যমে আসামের নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড (NRL) কোম্পানি থেকে প্রচুর পরিমাণে ডিজেল আমদানি করে, যা বাংলাদেশের কৃষি ও পরিবহণ খাতে জ্বালানির প্রয়োজনীয়তাকে অনেকটা মেটায়। ২০২৬ সালের শুরুতে ভারত সরকার NRL-কে ১,৮০,০০০ টন ডিজেল বাংলাদেশে রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে। ভারতের The Gas Authority of India (GAIL) বাংলাদেশের কোম্পানি মোহনা হোল্ডিংস এবং বামকো এনার্জির সঙ্গে যৌথভাবে LPG উত্তোলনে কাজ করছে।

এসমস্ত কৃষিজপণ্য, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, রাসায়নিক, বিদ্যুৎ, জ্বালানি প্রভৃতি বিষয়গুলো ছাড়াও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আরও বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক আদান-প্রদান হয়। ভারত বিটুমিনসহ অন্যান্য খনিজ পদার্থ, রেল ইঞ্জিন ও রেল যন্ত্রাংশ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ প্রভৃতি রপ্তানি করে এবং বাংলাদেশ থেকে বিমান নির্মানের সামগ্রী আমদানি করে। ভারতীয় বৃহত্তর টেলিকম কোম্পানিগুলি বাংলাদেশে টেলিকম খাতে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করে এবং ভারতীয় FMCG কোম্পানিগুলিরও বাংলাদেশ বাজারে ভালো বিনিয়োগ রয়েছে। এছাড়াও দুই দেশে কর্মরত দক্ষ কর্মচারিরা প্রতি বছর নিজ নিজ দেশে ভালো পরিমান রেমিট্যান্স পাঠায় ও দেশীয় অর্থনীতিতে সহায়তা করে। সাম্প্রতিককালে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৬টি রেল যোগাযোগ পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে ত্রিপুরার আগরতলা স্টেশন থেকে বাংলাদেশের আখাউড়ার মধ্যে ষষ্ঠ আন্তঃসীমান্ত রেল সংযোগ উদ্বোধন করা হয়েছে। এটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির সাথে বাংলাদেশকে রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত করবে। এই প্রকল্প ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সাথে বাংলাদেশের প্রথম রেল সংযোগ, এই প্রকল্পের জন্য ভারত সরকার ৪০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। আখাউড়া–আগরতলা আন্তঃসীমান্ত রেল যোগাযোগ চালু হলে কলকাতা থেকে বাংলাদেশ হয়ে আগরতলা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করতে পারবে, যা হবে শিলিগুড়ি করিডোর ছাড়াও উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সাথে ভারতের যোগাযোগের বিকল্প এক পথ। ২০২১ সালে হলদিবাড়ি–চিলাহাটি রেল সংযোগ, এছাড়াও পেট্রপোল-বেনাপোল, গেদে–দর্শনা, সিংহবাদ–রোহনপুর, রাধিকাপুর–বিরল -এর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ রেল সংযোগ নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে দুটি দেশের মধ্যে তিনটি রেলওয়ে ট্রেন চলাচল করছে– মৈত্রী এক্সপ্রেস (২০০৮) কলকাতা-ঢাকা, বন্ধন এক্সপ্রেস (২০১৭) কলকাতা-খুলনা, মিতালী এক্সপ্রেস (২০২২) নিউ জলপাইগুড়ি-ঢাকার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ভারতের কলকাতা, আগরতলা, গুয়াহাটি থেকে ঢাকা, খুলনার মধ্যে চারটি বাস সার্ভিসও চালু রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ জলপথের মাধ্যমে বাণিজ্য ও পরিবহনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ জলপথ বাণিজ্য ও পরিবহন 'Protocol on Inland Waterways Trade and

Transit' (PIWTT) দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর রয়েছে। ২০২১ সালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ফেনী নদীর ওপর মৈত্রী সেতু উদ্বোধন করেছেন। যার মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশের রামগড়কে যুক্ত করা যাবে, আর এর ফলে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা আরও বাড়বে। তবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এই সেতুর মাধ্যমে যাত্রী পরিবহণ ও নিয়মিত বাণিজ্য বিনিময় এখনো সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী 'খুলনা-মোংলা বন্দর রেললাইন প্রকল্প' উদ্বোধন করেন, যার মাধ্যমে মোংলা বন্দর থেকে ৬৫ কিমি রেললাইন নির্মাণ করে খুলনা রেল নেটয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। ভারতের আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি নির্মিত হয়েছে এর মাধ্যমে দুই দেশের বাণিজ্য গতি পাবে, তবে দুই দেশের রাজনীতির কারণে এই প্রকল্প এখনো কার্যকর হয়নি। এছাড়া ভারত বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা, যেমন উভয় দেশ যৌথভাবে তৈরি করেছে Indian Council for Cultural Relations (ICCR) ভারত বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়, শিক্ষা ক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে স্কলারশিপ প্রদান, যৌথ প্রযোজনায় সিনেমা নির্মান, তথ্য বিনিময়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ইতিবাচক কর্মসূচী লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও সামরিক ক্ষেত্রে দুই দেশের যৌথ সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব, যেমন যৌথ মহড়া (সম্প্রীতি), নিরাপত্তা, সীমান্ত সুরক্ষা, সন্ত্রাসবাদ দমন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে কিছু উগ্র মৌলবাদী শক্তি ভারতবিরোধী কর্মকান্ড, জনগণের মধ্যে ভারতবিরোধী প্রচার এবং সমাজ মধ্যমে ভারতবিরোধী বক্তব্য প্রদান করছে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বাংলাদেশে হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ হয়, তাদের বাসস্থান ও উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়। এর বিরুদ্ধে সনাতন জাগরণ জোটের মুখপাত্র শ্রী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রতিবাদ করায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় ভারত সরকার বাংলাদেশে হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে (Ministry of External Affairs, Government of India, November, 2024)। এই ঘটনার মাধ্য দিয়ে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সন্দেহ দানা বাঁধে এবং সম্পর্ক অবনতির দিকে যায়। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে দুই দেশই তাদের স্থলপথের মাধ্যমে বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা আনার ফলে ঘুরপথে জলপথের মাধ্যমে কলকাতা ও মুম্বাই বন্দর দিয়ে বাণিজ্য পরিচালনা করতে হচ্ছে। এর ফলে অতিরিক্ত অর্থ ও সময় ব্যয় হচ্ছে, এবং এই সন্দেহের বাতাবরণে দুই দেশের মধ্যে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দুই দেশের অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক মহল। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়াস করছে। ২০২৫ সালের জুলাই সনদে তারা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণভোটের আয়োজন করার কথা ঘোষণা করেছে, যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটি স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ, দুই দেশই রাষ্ট্রীয় স্তরে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই সন্দেহের বাতাবরণকে প্রশমিত করে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে BIMSTEC এর সম্মেলনে ব্যাংককে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনূসের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দুই প্রধানই দু-দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করেন (Ministry of External Affairs, Government of India, April, 2025)। আশা করা যায় রাজনীতির জটিলতা কাটিয়ে আবার দুই দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে।

References:

1) Anisuzzaman, Mohammad. Mamun, Harun Ar- Rashid. The Liberation War of Bangladesh: Emergence of Nationalism in the Political Context. International Journal of Social Science and Human Research, 2022, pp. 889-902.
2) Chaudhuri, P. P. India-Bangladesh relations: Strategic partnerships and challenges. Oxford University Press. 2021.
3) Chopra, V. K. India and Bangladesh: The role of regional co-operation. Sage Publications. 2021.
4) Chowdhury, Suman. Bangladesh crisis to have moderate impact on Indian industry. Acuite ratings and research, Kanjurmarg, Mumbai, 2024.
5) Dowlah, Caf. The Bangladesh Liberation War, the Sheikh Mujib Regime, and Contemporary Controversies. Lexington books, London, 2016. pp. 75, 77.
6) Kaur, Harsimran. Singha, Sanjoy. Recent Developments in India Bangladesh relations. The Academic, India, 2024.
7) Khan, Arafat Hosen. Judicial authority and democratic legitimacy: Bangladesh's caretaker government judgment and the question of prospective application. LSE Law School, 2025.
8) Mandal, Srikanta. India-Bangladesh relations under the recent interim government of bangladesh: a new era of diplomacy and challenges ahead. International Journal of Creative Research Thoughts, 2025.
9) Upadhyay, R. De-Pakistanisation of Bangladesh. South Asia Analysis, 2007.
10) After the "Golden Era": Getting Bangladesh-India Ties Back on Track, international crisis group, Brussels, Belgium, 2025. https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2025-12/353-bangladesh-india-back-on-track_0.pdf
11) Prime Minister Shri Narendra Modi met Professor Muhammad Yunus, Chief Adviser of Bangladesh on the sidelines of the BIMSTEC Summit in Bangkok, Thailand. https://www.mea.gov.in/newsdetail1.htm?13453/
12) Prime Minister receives telephone call from the Chief Adviser, Interim Government of Bangladesh, August 16, 2024 https://www.mea.gov.in/Images/Amaz/CAGB-1908-Bengali.pdf
13) Report - Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest in Bangladesh, United Nations Human Rights, OHCHR, 16 August 2024. https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-08/OHCHR-Preliminary-Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in-Bangladesh-16082024_2.pdf
14) Fact-Finding Report Human Rights Violations and Abuses related to the Protests of July and August 2024 in Bangladesh, United Nations report, issued by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), on 12 February 2025. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/bangladesh/ohchr-fftb-hr-violations-bd.pdf
15) Brief on India-Bangladesh bilateal relations. https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-Bangladesh2024.pdf
16) Ministry of External Affairs, Government of India. (2022). India-Bangladesh Relations. https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India Bangladesh_Relations_April_2021.pdf
17) Ministry of Commerce and Industry, Government of India. (2021). India-Bangladesh Trade.Retrieved from https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1725856
18) চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ ও নন্দী, দেবাশিস। বিদেশনীতি ও সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি। Progressive Publishers, Kolkata, 2012, pp. 107-122.